এই সময়
কথাসরিৎ

প্রকৃত সমতার অর্থ এই নয় যে সবার সঙ্গে একই ব্যবহার করতে হবে, এর অর্থ হল প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি সমান নজর দেওয়া।
— টেরি ইগলটন

দূষণ

সরকারি তরফে বায়ুদূষণ নিয়ে দুশ্চিন্তা অবশ্যই প্রার্থনীয় কিন্তু তার সমাধান যেন দীর্ঘমেয়াদি হয়, সে দিকে খেয়াল রাখাটা জরুরি। কারণ দূষণ শুধু জনস্বাস্থ্যই নয়, অর্থনৈতিক নিরিখেও বিপুল ক্ষতির কারণ। সারা দেশে শীত আসন্ন। এই সময়টিতে বায়ুদূষণের প্রকোপও বৃদ্ধি পায়, বিশেষত দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এটি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান ও সাক্ষ্যভিত্তিক সুসমন্বিত উদ্যোগ। স্রেফ জনসাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষক প্রচেষ্টা দিয়ে এ সমস্যা মেটার নয়। সম্প্রতি দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দূষণ মোকাবিলায় স্থাপিত হল একটি নতুন সংস্থা — দ্য কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট। এই উদ্যোগের ইতিবাচক দিক হল, সমস্যাটির গভীরতা নিয়ে সরকার যে সচেতন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দ্বিতীয়ত, কোনও নির্দিষ্ট সংস্থার উপর যদি সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু পাশাপাশি এটিও মনে রাখা দরকার যে, স্রেফ একটি প্রতিষ্ঠানই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কারণ সমস্যাটির মূলে আছে, সব সরকারের তরফেই সংকটের গভীর যাওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা ও ব্যর্থতা এবং শুধুমাত্র কিছু বিশেষ মরশুমে বা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সচেষ্ট হওয়া। উপরন্তু সেই প্রকল্পগুলিই সাধারণত গৃহীত হয়, যেগুলির রূপায়ণ প্রত্যক্ষ ভাবে দৃশ্যমান।

তাৎক্ষণিক সমাধান প্রাপ্তির প্রবণতাটি প্রবলতর হয়েছে নানাবিধ পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে প্রায়শ আদালতের হস্তক্ষেপের দরুণ। আদালতের নির্দেশিকা মান্য করাটাই মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে প্রশাসনের। অন্য দিকে, সরকারি তরফে উদ্যোগ দেখা গেলে জনসাধারণও সন্তুষ্ট। অথচ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ নাগরিকবৃন্দের দৈনন্দিন জীবনচর্যা। সে ক্ষেত্রে স্থায়ী বদল না ঘটলে দূষণের ছবিটির পরিবর্তন কার্যত অসম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত অভ্যাস পাল্টানো কঠিন এবং শ্রমসাধ্য, বিশেষত মানসিক দিক থেকে, অতএব সাধারণ মানুষও দায়টি সরকারের উপর ন্যস্ত করতে পারলেই সন্তুষ্ট। সর্বোপরি, বায়ুদূষণ রোধে যে আইনগুলি ইতিমধ্যেই আছে, তাদের যথাযথ রূপায়ণের ক্ষেত্রে গাফিলতি। ফলত সংকট ক্রমেই ঘনীভূত। এমতাবস্থায় অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত উল্লিখিত কমিশনটি সফল হতে পারে তখনই, যদি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ, সরকার, জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ও জনসাধারণ। আর একটি প্রশ্নও এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। শুধুমাত্র রাজধানী অঞ্চলেই কেন এই উদ্যোগ সীমিত থাকবে? ভারতের বড় শহরগুলির প্রত্যেকটিতেই এই ধরনের সংস্থার আশু প্রয়োজন।

অসুখ

অতিমারী ও লকডাউনে এ দেশে সহনাগরিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যের অনেক নজির দৃশ্যমান হয়েছে, উন্নততর সমাজের স্বপ্নকল্পের সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু এ সবের মধ্যে যখন দেখা যায়, মানসিক ভারসাম্যহীন কোনও মানুষকে স্রেফ চোর সন্দেহের বশে পিটিয়ে মারা হচ্ছে, অর্থাৎ অসহিষ্ণুতা ও গণপিটুনির সংস্কৃতিটিতে কোনও পরিবর্তনই হয়নি, তখন আদতে কতটা সহমর্মী হয়ে উঠছে সমাজ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। সংবাদে প্রকাশ, ফারাক্কার সমশেরগঞ্জে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন করেছে জনতা। মানসিক

বামপন্থীদের অন্য দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যেতে হতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তিতে সর্বনাশ

শতবর্ষ পরে কোন নবযুগ আনবেন কমরেড?

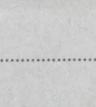

১৯২০-র অক্টোবরে তাশকেন্ত-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। এক শতক পরে তারা কোন চ্যালেঞ্জের মুখে? লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

বিসিসিএল

প্রত্যেক বছর ১৭ অক্টোবর, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) অর্থাৎ সিপিআই (এম) অবিভক্ত পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। এই বছরও প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছে। কলকাতা জেলা কমিটির সদর দপ্তর প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে। একশো বছর আগে পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশকেন্ত শহরে। সেই পার্টি ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতার পরে আরও বড় হয়েছিল। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে পার্টি আরও বড় হয়। ১৯৫২, ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালে লোকসভায়, কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান বিরোধী হয়। পার্টি ভেঙে যায় ১৯৬৪ সালে। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনেও ভারতের সব থেকে বড় কমিউনিস্ট পার্টি হয়। আর সিপিআই (এম) পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বড় বামপন্থী পার্টি হয়। কিন্তু তত দিনে ভারতের শাসক শ্রেণি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরও দুটো পার্টিকে মদত দিচ্ছে। এক দিকে ভারতীয় জনসংঘ ও অন্য দিকে স্বতন্ত্র পার্টি। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের পর মার্কিন সরকার, ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ের বিদেশনীতিকে সামনে রেখে দক্ষিণ এশিয়ায় আরও তৎপর হয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া বামপন্থী বিচ্যুতির মধ্যে সিপিআই(এম) হারিয়ে যায়নি। মস্কো লাইন, বেজিং লাইন আর গোপনে ওয়াশিংটন লাইনের পাকেচক্রে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে তালা পড়ে যায়। ১৯৭৭ সাল থেকে সিপিআই(এম) ভারতের সব থেকে বড় কমিউনিস্ট পার্টি হয়। কারণ তারা সেই সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি লাইন মানেনি আর নকশালদের মতো চীনাপন্থীও হয়নি।

ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা একটি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়তে চেয়েছিল। এবং তারা কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এ রকম বহুবার হয়েছে যখন তারা একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরালায় রাজ্য সরকার চালিয়েছে। ১৯৮০-র দশকে পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে তাদের ভালো প্রভাব ছিল। আজও দক্ষিণের রাজ্যগুলোয় কিছুটা আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রভাব ২০০৯ সাল থেকে কমতে শুরু করে। বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র কলকাতার একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে পার্টির হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে উপদেশ দিয়েছিলেন যে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট যেহেতু হেরে গিয়েছে তাই মানুষের সামনে খোলা মনে পার্টি নেতৃত্ব যেন বামফ্রন্ট সরকার এবং পার্টির ভুলত্রুটিগুলো জনগণের সামনে রাখে এবং সরকার ভেঙে দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে। তাতে হয়তো ২০১১ সালের ভরাডুবি থেকে বামফ্রন্ট কিছুটা মুখ রক্ষা করতে পারত। অশোকবাবুর যুক্তি ভালো ছিল কারণ ২০০৯ সালে বিধানসভা নির্বাচন হলে ভবিষ্যতে কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গ, একই বছরে দুই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হত না। ফলে কেরালায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট আর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বামফ্রন্ট বন্ধুত্ব, এই দোটানা একই বছর পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মাথাব্যথার কারণ হত না। তিনি এও বলেছিলেন যে পার্টি যদি অতীত ভুল থেকে শিক্ষা না নেয় তা হলে অচিরে পশ্চিমবঙ্গে পার্টির মৃত্যু হবে।

পার্টির শতবার্ষিকীতে সিপিআই(এম)-এর সামনে দুটো বড় নির্বাচন। ২০২১ সালে কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গ। একশো বছরের পুরাতন পার্টি কী ভাবছে এবং তারা আগামী দিনে কী করবে, সে কথা শুনতে প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে গিয়েছিলাম এক শিক্ষক-গবেষক হিসেবে। ছাত্র জীবনে প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে নেতৃত্বের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস ছিল। এবারে অবশ্য একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র শুনতে হচ্ছিল জুমে এবং মাঝে মধ্যে পার্টি নেতৃত্ব নতুন কী বলছেন সেই দিকে মন দিয়ে, অন্য কান খোলা রেখে। তবে সিপিআই(এম)-এর আলোচনার দিকেই বেশি মন ছিল। কারণ ওই বড় হলঘরের গ্যালারিতে বসে পার্টির নেতা-নেত্রীদের বক্তৃতা শোনা ছাত্র জীবনের পুরনো অভ্যেস। পুরনো অভ্যেস কি সহজে ছাড়া যায়? গবেষক হিসেবে নোট নিতে হচ্ছিল। নোটবুক খুলে দেখি ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে জয়পুর সাহিত্য উৎসবে একটি প্যানেলে আলোচনার ডাক পড়েছিল। সেই সভায় 'লিগেসি অফ লেফট' নামক এক আলোচনায় যে কথাগুলো বলেছিলাম আর সঞ্চালকের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেই একই নোটবুক। ১০০ বছরের পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসের সভার নির্যাস প্রকাশ করছি কারণ আজকাল বামফ্রন্ট কি বলছে আর কি করছে তাই নিয়ে সংবাদমাধ্যমে তেমন আলোচনা হয় না।

মঞ্চে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু যথারীতি সভার সভাপতি ছিলেন। পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র কোভিড পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বললেন যে গত ১৫০ বছরে পৃথিবী জুড়ে এমন অসাম্য আগে দেখা যায়নি যা বর্তমান কালে দেখা যাচ্ছে। পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি হিন্দি এবং ইংরেজি মিলিয়ে মিশিয়ে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় বক্তব্য পেশ করলেন। যদিও তাঁর বক্তৃতার আগে তিনি বাংলায় বলবেন না হিন্দি-ইংরেজি মিলিয়ে বলবেন, তা নিয়ে সভায় সামান্য বিতর্ক ছিল। তিনি 'কাকাবাবু' মুজফফর আহমেদ ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কথা বললেন। একশো বছরের পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরলেন আর বললেন হসরত মোহানির কথা যিনি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান তুলেছিলেন। সীতারাম বললেন যে আজকের ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থা এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য পার্টি লড়াই করবে। এ ক্ষেত্রে গান্ধী এবং আম্বেদকরের সঙ্গে কমিউনিস্টদের অতীতে দূরত্ব ছিল। কারণ কমিউনিস্টরা মার্কসবাদে বিশ্বাস করে। আর যারা মার্কসবাদে বিশ্বাস করে তারা বিজ্ঞান এবং বিপ্লবে বিশ্বাস করে। তিনি বাস্তবকে স্বীকার করে বললেন যে কমিউনিস্টরা ভারতে দুর্বল হতে পারে কিন্তু বামপন্থী আন্দোলন এবং লড়াই চলবে কারণ ভারতের শাসক শ্রেণি দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। সেই লড়াই বন্দুক ধরে হবে না। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের মন জয় করে চলবে এবং সেই লড়াই কংগ্রেসকে নিয়েও করতে হবে।

মিডিয়ায় থাকলেন না গেলেন তাতে কী এসে গেল! মিডিয়াকে তো শ্রমজীবী মানুষের পার্টি কখনও কুক্ষিগত করতে পারবে না। তাই এমন রাজনীতি করুন যেখানে মিডিয়া বাধ্য হয় এটা বলতে যে আপনি যথার্থ দাবি তুলছেন।

পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য, মহম্মদ সেলিম, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। বললেন যে এক কালে যে রকম ব্রিটিশ পুলিশ দেশদ্রোহিতার জন্য বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক মানুষকে জেলে পুরত তেমন আজ সিএএ এবং সরকার-বিরোধীদের জেলে ঢোকাচ্ছে মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বললেন যে আজ রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' আমাদের পড়তে হবে। কোভিড পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের সংকট আরও তীব্র হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে পার্টিকে কয়েকটি বুনিয়াদী জিনিস শিখতে হবে। 'থিঙ্ক গ্লোবাল, অ্যাক্ট লোকাল' এই মূলমন্ত্র নিয়ে শ্রেণি রাজনীতিকে মজবুত করতে হবে আর মিডিয়াকে আকৃষ্ট করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তার সঙ্গে উদ্ভাবনী শক্তির সঞ্চার ঘটিয়ে পার্টিকে উজ্জীবিত করতে হবে। পরিশেষে তিনি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের 'বোল কে লব আজাদ হ্যায় তেরে' কবিতার দুটো লাইন পড়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। কথাগুলো নতুন নয়। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে বেশ ফাঁকা হলঘরে কিছু ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের উপস্থিতি ভাল লাগল। পশ্চিমবঙ্গের পার্টির জন্য তা শুভ। একশো বছরের পার্টি আজ যদি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে থাকে তা হলে ৯৫ বছরের বৃদ্ধ আরএসএস সামাজিক ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, ত্রাণ এবং বিভিন্ন রকমের সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি ঘটিয়ে মানুষের মগজে ঢুকে পড়ছে। কংগ্রেস ও বামপন্থীদের তুলনায় স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস-এর তেমন উল্লেখযোগ্য ভুমিকা না থাকলেও নতুন প্রজন্মের কাছে তারা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

একশো বছরের পার্টির কাছে তা হলে নতুন চ্যালেঞ্জ কী? আরএসএস-কে সামাজিক ক্ষেত্রে মোকাবিলা করতে গেলে শুধু পুরাতন নিয়মে ভোট-রাজনীতির জাঁতাকলে পড়লে কি পার্টি ঘুরে দাঁড়াবে? পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বামপন্থীরা যে জনপ্রিয় গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই ভাবে কিছু করলে কি পার্টির উন্নতি হবে? নাকি নতুন শতাব্দীর নতুন প্রজন্মের নতুন দাবিকে সামনে রেখে এক নব্য ঘরানার বামপন্থী রাজনীতি মানুষ চাইছে?

এই প্রশ্নগুলো শুধু বামপন্থী পার্টিগুলোর নেতা-নেত্রীদের ভাবার কথা নয়। যে কোনও বামপন্থী মানুষের কাছে এই প্রশ্নগুলো আজকের দিনে অনেক প্রাসঙ্গিক। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধী যে দিন আমেঠি আসনের সঙ্গে কেরালার ওয়ানাদ আসন থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন সে দিন কংগ্রেস লোকসভায় যে গোহারান হারবে তা বোঝা গিয়েছিল। দেশে বিজেপি-বিরোধী শক্তি নিজেদের মধ্যে একতা না থাকায় পর্যুদস্ত হয়েছিল। তার সঙ্গে কেরালায় বামফ্রন্টকেও চরম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। নির্বাচন আসবে, নির্বাচন যাবে। কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে জোট রাজনীতি হয়তো করতে হবে নির্বাচনী বাধ্যবাধকতার জন্য। কিন্তু বামপন্থী শক্তিকে কেবল কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে পুরনো অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। বরং ওই পার্টি লাইনে চললে উত্তর ভারতে এক সময় যেমন বামপন্থী শক্তি জাতপাতের রাজনীতি ভালো করে বোঝার না ফলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে তেমন পশ্চিমবঙ্গে — শ্রেণি রাজনীতির সঙ্গে ভাষা, লিঙ্গ ও জাতপাতের রাজনীতিকে ভালো করে না বুঝলে অদূর ভবিষ্যতে আরও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে হবে। বামপন্থী রাজনীতি করতে গেলে তৃণমূলের মতো আঞ্চলিক দলগুলোর তুলনায় আরও বেশি বামপন্থী রাজনৈতিক লাইন নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে রাজনীতি করতে হবে।

মিডিয়ায় আপনি থাকলেন না গেলেন তাতে কী এসে গেল! মিডিয়াকে তো শ্রমজীবী মানুষের পার্টি কখনও কুক্ষিগত করতে পারবে না। তাই এমন রাজনীতি করুন যেখানে মিডিয়া বাধ্য হয় এটা বলতে যে আপনি প্রাসঙ্গিক কথা বলছেন এবং যথার্থ দাবি তুলছেন।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক